Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 37
Website: https://tirj.org.in, Page No. 312 - 322
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, published on July 2024, Page No. 312 - 322
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ : পশ্চিমবঙ্গের নাটককারদের প্রতিক্রিয়া

অমর ভাণ্ডারী
গবেষক, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : abhandari2321993@gmail.com

Received Date *16. 06. 2024*
Selection Date *20. 07. 2024*

Keyword
Liberation War, Liberation Army, Political Drama, Colonial Exploitation, Class Enemy, Mujibur Rahman, Genocide.

Abstract
The liberation war of Bangladesh in 1971 deeply moved the south Asian political landscape. The long-suppressed dissent and a rampant violation of humanitarian values including rapes, murders etc. left an entire linguistic community to an existential threat, who ultimately found an agency through this revolt which made possible to reclaim their self-dignity and asserting their true identity. This saga of unprecedented struggle to establish a community's selfhood became the subject of several notable dramatists of that time such as Digin Bandopadhyay, Utpal Dutt, Anil Dey, Swapan Kumar Mitra, etc. These dramatists not only showcased the movement by enshrining the events as it proceeded but also at the same time amplified their agendas. Apart from the national borders that divided two countries, the underlying sentiment of communitarian values became a major factor that helped in unification of a common voice of protest. Dramatists from West Bengal majorly articulated two significant crises of the movement in their works – at one hand the confrontation between the Pakistani repressive forces and the common people of Bangladesh and on the other hand the internal tensions within the socio-economic structures of Bangladesh that strengthen the feudal lords namely the 'jotedar', capitalists. Therefore, the dramatists felt a moral compulsion to delineate an ambivalence on part of the liberation army who not only had to fight against the Pakistani armies but also the 'jotedars' in their own land.

Discussion

ইতিহাসের পটভূমিকায় বিশ শতকের ছয় ও সাতের দশক সংগ্রামী মানুষের মুক্তির অদম্য ইচ্ছাকে ডানা মেলতে শিখিয়েছে। এই দুই দশকেই ফ্রান্স, ইতালি, বেলজিয়াম ও ব্রিটিশদের হাতে দীর্ঘদিন ধরে পরাধীন থাকা ক্যামেরুন, টোগো, মালি, মাদাগাস্কারসহ আফ্রিকার ১৭টি দেশ স্বাধীনতা লাভ করে। লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে জনগণ বিপ্লবে সোচ্চার হয়ে ওঠে, আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদকে ভিয়েতনামের সাধারণ মানুষ রুখে দিতে সক্ষম হয়।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 37
Website: https://tirj.org.in, Page No. 312 - 322
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

এসবের পিছনে কাজ করেছিল শোষণ ও অবদমনের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার বাসনা, ঔপনিবেশিক মনোভাবের প্রতি তীব্র ঘৃণা, পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচন করে স্বাধীনভাবে বাঁচার তাগিদ। এমনই ঘটনা ঘটেছিল প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশে। দীর্ঘ পরাধীনতার গ্লানি মুছে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পেয়েছিল ঠিকই, কিন্তু দেশের বিভাজনকেও স্বীকার করতে হয়েছিল। ভারত ভেঙে তৈরি হয়েছিল পাকিস্তান। তবে এর ভৌগোলিক অবস্থান ছিল বিচিত্র। ভারতের পশ্চিমপ্রান্তে ছিল পশ্চিম-পাকিস্তান— যেখানে অধিকাংশ অধিবাসী পাঞ্জাবি মুসলমান এবং পূর্বপ্রান্তে ছিল পূর্ব-পাকিস্তান— এখানের অধিবাসীরা মূলত বাঙালি মুসলমান। দু'প্রান্তের বাসিন্দাদের ভাষা-সংস্কৃতি-মনন সব কিছুই ছিল ভিন্ন। তা নিয়ে শুরু থেকেই দ্বন্দ্ব প্রকট হতে থাকে। ১৯৭১-এ গিয়ে তা এমন পর্যায়ে পৌঁছোয় যে, শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান-বিভাজনের প্রয়োজন পড়ে। প্রতিষ্ঠিত হয় 'বাংলাদেশ'। রাজনীতির এই পটভূমিতে ভারতের সক্রিয় অবস্থান ছিল। বাংলাদেশের 'মুক্তিযুদ্ধ'-র প্রভাব বাংলা শিল্প-সাহিত্য-অভিনয়কলায় খুব প্রত্যক্ষভাবেই পড়ে। এক্ষেত্রে নাটক বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল; রণভূমিতে যখন মুক্তিবাহিনী পাকিস্তানি সেনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে, তখন নাটককাররা নিজেদের নাটককে হাতিয়ার করে জনমত গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। ওপার বাংলায় এ বিষয় নিয়ে নাটক রচনার পাশাপাশি এপার বাংলার থিয়েটারেও বেশ কিছু নাটক পরিচালিত হয়েছে। এর পিছনে কাজ করেছিল বাঙালি আবেগ। ওপার বাংলায় বাংলা ভাষাভাষী যেসব জনগণ বাস করত, ঘটনাস্রোতে তারা অন্যদেশের বাসিন্দা হলেও তাদের সঙ্গে এপার বাংলার যোগাযোগ ছিল আত্মিক। যে আত্মার মূল ছিল একই ভাষা ও একই সংস্কৃতির মাটিতে রোপিত। ফলে তাদের উপর যখন আঘাত আসে এবং রাষ্ট্রীয় স্বৈরাচার যখন পুনরায় ঘর ছাড়তে বাধ্য করে, রাতারাতি তারা উদ্বাস্তু হয়ে পড়ে তখন খুব স্বাভাবিক ভাবেই এপার বাংলার শিল্পী বুদ্ধিজীবী সাহিত্যিক নাট্যকর্মীরা চুপ করে বসে থাকতে পারেননি। তাঁরা পথে নেমেছেন, সভা করেছেন, উপন্যাস-গল্প-কবিতা লিখেছেন, গান বেঁধেছেন, যাত্রা সভায় বাংলাদেশিদের সংগ্রাম প্রচার করেছেন, থিয়েটার মঞ্চে মুক্তিযুদ্ধ অবলম্বনে নাটক প্রদর্শনও করেছেন।

২

নাটকের বিষয়ে যাওয়ার আগে বাংলাদেশের 'মুক্তিযুদ্ধ' সম্পর্কে দু-চার কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন। ৭ ডিসেম্বর ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিপুল জয় ও পাকিস্তান পিপল্‌স পার্টির ভরাডুবিই ছিল দ্বন্দ্বের মূল কারণ। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পাকিস্তানের নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী হয়। আওয়ামী লীগের এই সাফল্য মূলত আসে পূর্ব-পাকিস্তান থেকে, যেখানে পি. পি. পি. একটি আসনও পায়নি। এর পিছনে কাজ করেছিল বেশ কিছু কারণ। অ্যান্থনী মাসকারেনহাস পশ্চিম-পাকিস্তানের উপর পূর্ব-পাকিস্তানিদের ক্ষিপ্ত হওয়ার চারটি কারণ দেখিয়েছেন— ১. রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাঙালিদের অস্বীকার করা, ২. তাদের মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দানে দীর্ঘ দিনের অনিচ্ছা, ৩. পশ্চিম-পাকিস্তানি কর্তৃক পূর্ব-পাকিস্তানিদের করুণার চোখে দেখা এবং ৪. অর্থনৈতিক বৈষম্য।[১] নির্বাচনের ফল এটা নির্দিষ্ট করে দিল যে, পরবর্তী সমস্ত ক্ষমতা থাকবে পূর্ব-পাকিস্তানের হাতে। যা পশ্চিম-পাকিস্তানি নেতৃত্বের পছন্দ হয়নি। আওয়ামী লীগের দাবি ছিল ছয় দফা নীতির ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র পরিচালনা করা। কিন্তু নানা টালবাহানার মাধ্যমে পরিষদ গঠন এড়িয়ে যায় ইয়াহিয়া গোষ্ঠী। অবশেষে ১ মার্চ বেতার মাধ্যমে ঘোষণা করা হয় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখার কথা।[২] এই ঘোষণায় জনগণ ক্ষোভে ফেটে পড়ে, আর পূর্ব-পাকিস্তানে সংকট ক্রমশ নাশকতার দিকে এগোতে থাকে। পাকিস্তানি শাসক ১১০ নং সামরিক আইন জারি করে সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে এবং জনগণের আন্দোলন রদ করার জন্য প্রতিদিন সন্ধ্যা ৭টা থেকে সকাল ৭টা পর্যন্ত কারফিউ জারি করা হয়।[৩] কিন্তু জনগণ তা অমান্য করে নিজেদের প্রতিবাদ প্রদর্শন করতে গেলে সেনাবাহিনীর গুলিতে বহু মানুষ মারা যায়। এর

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 37
Website: https://tirj.org.in, Page No. 312 - 322
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

প্রতিবাদে শেখ মুজিবুর অহিংস-অসহযোগ আন্দোলনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। মুজিবুর ৭ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানের সমাবেশে অধিবেশনে যোগ দেওয়ার ক্ষেত্রে চারটি পূর্ব-শর্ত রাখেন— ১. সামরিক আইন প্রত্যাহার করতে হবে, ২. সেনাকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে হবে, ৩. নির্বাচিত জন-প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে এবং ৪. গণহত্যার উপযুক্ত তদন্ত করতে হবে।[৪] এই সমাবেশে লক্ষাধিক লোক জড়ো হয়েছিল। এই দিনই তিনি অহিংস-অসহযোগ আন্দোলনের দশ দফা নীতি ঘোষণা করেন। যেমন— সকল প্রকার কর বন্ধ করা, সরকারি অফিস আদালতে হরতাল পালিত করা, সামরিক বাহিনীর যোগাযোগ ব্যবস্থায় অসহযোগ করা, রেডিও, টেলিভিশনে আন্দোলনের সংবাদ প্রচার না করলে সেখানকার বাঙালি কর্মচারীরা অসহযোগিতা করবে, শুধুমাত্র অন্তঃজেলা টেলিফোন যোগাযোগ চালু থাকবে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে, পূর্ব-পাকিস্তানের টাকা পশ্চিম-পাকিস্তানে পাঠানো যাবে না, সকল গৃহে ও প্রতিষ্ঠানে কালো পতাকা উত্তোলন করতে হবে ইত্যাদি।[৫] আন্দোলন এমন পর্যায়ে যায় যে, পূর্ব-পাকিস্তানের সমস্ত প্রশাসনের ক্ষমতা আওয়ামী লীগের আওতায় চলে আসে। তাতে শঙ্কিত হয়ে শেষে ইয়াহিয়া খান ১৫ মার্চ ঢাকায় আসেন এবং ক্ষমতা হস্তান্তর সূত্রে দফায় দফায় মুজিবুর-ইয়াহিয়া বৈঠক হয়। যদিও তার কোনও সদর্থক ফল হয়নি। এর মধ্যে ১৯ মার্চ ঢাকার অদূরে জয়দেবপুরে পাকিস্তান সেনাবাহিনী গুলি করে বহু লোককে হত্যা করে।[৬] এই উত্তাল পরিস্থিতিতে ২৩ মার্চ বহু জায়গায় বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন হয়।[৭] বুঝতে বাকি থাকল না যে গতি কোন দিকে।

পূর্ব-পাকিস্তানের স্বাধীনতা সংগ্রামে কমিউনিস্টদের ভূমিকা সম্পর্কেও কিছু বলতে হয়। এরা প্রথম থেকেই 'জাতীয় মুক্তি নির্বাচনে আসতে পারে না' এই অভিমত প্রকাশ করতে থাকে এবং জনগণের প্রতি আহ্বান জানায় সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে দেশকে স্বাধীন করার। সেই অনুসারে ১৯৭০ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি পল্টনের এক জনসভায় মাহাবুব-উল্লার নেতৃত্বে পূর্ব-পাকিস্তানকে 'স্বাধীন ও জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র' হিসেবে ঘোষণা করে ১১ দফা সম্বলিত কর্মসূচি ঘোষণা করে।[৮] তারা নির্বাচনেও অংশগ্রহণ করেনি। ১৯৭১-এর ২ মার্চ যখন পাকিস্তানের সেনা পূর্ব-পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে হত্যাকাণ্ড চালায় এবং তার প্রতিবাদে মুজিবুর রহমান অহিংস-অসহযোগের ডাক দেয় তখন কমিউনিস্ট পার্টি পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণকে সশস্ত্র সেনার বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম করার আহ্বান জানায়। তারা গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ করার কথা বলে। সেই উদ্দেশ্যে ৬ মার্চ স্বাধীনতাকামী সকল রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, কৃষক, শ্রমিক, বুদ্ধিজীবী, ছাত্র, দেশপ্রেমিক জাতীয় পুঁজিপতিদের সমন্বয়ে একটি ঐক্যফ্রন্ট গড়ার ডাক দেয় এবং 'পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তি ফৌজ' গঠনের উপর গুরুত্ব দেয়।[৯] ৯ই মার্চ পল্টনের ময়দানে এক জনসভায় মাওলানা ভাসানী কমিউনিস্টদের এই পদক্ষেপের সমর্থন এবং মুজিবের অহিংস-অসহযোগের বিরোধিতা করেন।[১০]

২৫শে মার্চ মধ্য রাতে পূর্ব-পাকিস্তানের বিভিন্ন জায়গায় চলে নৃশংস ও পৈশাচিক গণহত্যা। প্রথম 'টার্গেট' করা হয় ছাত্র-সমাজকে। ছাত্রদের হস্টেল 'ইকবাল হল' ও 'জগন্নাথ হল' এবং ছাত্রীদের হস্টেল 'রোকেয়া হল'-এ পাকিস্তানি সৈন্যরা আবাসিকদের পাশবিক নৃশংসতার পরিচয় রেখেছেন। দ্বিতীয় 'টার্গেট' করা হয় পূর্ব-পাকিস্তানি পুলিশদের। এছাড়াও সর্বত্র হত্যালীলা চলে। সেই রাত্রেই মুজিবুর রহমানকেও গ্রেপ্তার করে পশ্চিম-পাকিস্তানে নিয়ে যায়। অবশেষে ২৬ মার্চ চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে মেজর জিয়াউর রহমান 'স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করেন এবং ২৮ মার্চ জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট গঠনের আহ্বান জানানো হয়।[১১] ১৭ই এপ্রিল মুজিবনগরে আনুষ্ঠানিকভাবে 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ'-এর অস্থায়ী সরকার গঠন করা হয়। গঠিত হয় 'মুক্তিবাহিনী'। এই বাহিনী পাকিস্তানের কবল থেকে বাংলাদেশ মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত 'গেরিলা' পদ্ধতিতে মরণপণ লড়াই চালিয়ে যায়। আর অপরদিকে পাকিস্তানি সেনাও 'রাজাকার বাহিনী' তৈরি করে।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 37
Website: https://tirj.org.in, Page No. 312 - 322
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

এ কথা পূর্বেই বলা হয়েছে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের প্রত্যক্ষ যোগদান ছিল। ভারতের সাহায্য ছাড়া বাংলাদেশ পাকিস্তানের কবল থেকে মুক্ত হতে পারত না। মুজিবনগরে তাজউদ্দীন আহমেদ-এর নেতৃত্বে গঠিত স্বাধীন বাংলার সরকার বাংলাদেশে শপথ নিলেও সেসময় তাদের কার্জ পরিচালনার জন্য প্রধান দপ্তর করতে হয় কলকাতায়, থিয়েটার রোডে।[১২] এছাড়াও মুক্তিবাহিনীকে সামরিক প্রশিক্ষণ ও যুদ্ধের সরঞ্জাম দিয়ে প্রথম থেকেই ভারত সাহায্য করেছে। ভারতের বিশেষ ভূমিকা থাকে সেখান থেকে পালিয়ে আসা উদ্বাস্তুদের আশ্রয় ও নিরাপত্তা দেওয়ার ক্ষেত্রে। বাংলাদেশে পাকিস্তান সেনার হত্যালীলা থেকে বহু জনগণ প্রাণ বাঁচাতে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে আশ্রয়ের সন্ধানে আসতে থাকে। এপ্রিল থেকে সেই আগমন শুরু হয় এবং ডিসেম্বর অর্থৎ নিজেদের দেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত তা চলতে থাকে। নয় মাস ব্যাপী সময়ে প্রায় এক কোটি বাংলাদেশী ভারতে আশ্রয় নেয়।[১৩] গড়ে তোলা হয় উদ্বাস্ত শিবির। যার ফলে ভারতকে বিশাল আর্থিক বোঝা বইতে হয়েছে। ভারতের কূটনৈতিক সার্থকতা, আন্তর্জাতিক মঞ্চে পূর্ব-পাকিস্তানের সংকট সাফল্যের সঙ্গে তুলে ধরা এবং পাকিস্তানের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সামরিক যুদ্ধ করা বাংলাদেশের স্বাধীনতার পথ সুগম করেছিল।

৩

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিকায় উৎপল দত্ত দুটি নাটক রচনা করেন— 'ঠিকানা' ও 'জয় বাংলা'। 'ঠিকানা' নাটকটি ২ আগস্ট ১৯৭১ সালে একাদেমি অফ ফাইন আর্টসের মঞ্চে পিপলস্ লিটিল থিয়েটার কর্তৃক প্রথম অভিনীত হয়। বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছিল এই নাটক 'বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের মুক্তিসংগ্রামের কাহিনী।'[১৪] এই নাটকের মাধ্যমে নাটককার বাংলাদেশের জনগণের সংগ্রামকে কুর্নিশ ও সমর্থন করেছেন এবং পাকিস্তান সরকারের প্রতি আক্রমণ শানিয়েছেন। বাংলাদেশের জনগণের উপর পাকিস্তানের সেনাবাহিনী যে নির্মম বিচারহীন অত্যাচার চালিয়েছিল তার কথা এখানে সংলাপায়িত হয়েছে। সেসঙ্গেই ধরা পড়েছে বাংলাদেশের মানুষের টিকে থাকার এবং নিজেদের মাতৃভূমিকে স্বাধীন করার অদম্য ইচ্ছাশক্তি। নাটকটিতে যাবতীয় ঘটনার স্থান নির্ধারিত হয়েছে মানিকগঞ্জ এবং বিধৃত হয়েছে ১৯৭১-এর ২২ এপ্রিল থেকে ২৫ এপ্রিল পর্যন্ত মোট চারদিনের সময়কাল।

নাটকের মূল কাহিনি আবদ্ধ থেকেছে পাকিস্তান সেনা কর্তৃক বাংলাদেশের ছ'জন নির্দোষ নাগরিককে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার মধ্যে। সেই ছ'জন হল সাহাবুদ্দিন চৌধুরী, ডাক্তার আনিসুজ্জামান, যামিনী সেন, হাশমৎ আলি, রশিদা খাতুন ওরফে নানী ও হাসিবুন। এর পাশাপাশি স্থান পেয়েছে মুক্তিযোদ্ধাদের সংগ্রাম। পাকিস্তানি সেনার জন্য রেলগাড়ি করে বারুদ আনা হয়েছে যা মুক্তিযোদ্ধাদের উপর প্রয়োগ করা হবে। এই বারুদের গাড়ি ধ্বংস করতে তারা বদ্ধ-পরিকর। এক্ষেত্রে তাদের দরকার ডিনামাইটের। আর ডিনামাইট যেখানে পাওয়া যাবে তার ঠিকানা একমাত্র জানে নানী। অপর কাহিনিটি এক ব্যর্থ কাপুরুষ প্রেমিক বালুচি সন্তান তথা পাকিস্তানি সেনা আফজল বোখারির আত্মহত্যাকে ঘিরে আবর্তিত। যে আত্মহত্যাকে খুন বলে প্রচার করে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ছ'জনকে গ্রেপ্তার করে এবং পরবর্তীতে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ শোনায়। সমগ্র নাটক জুড়েই আছে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন বাংলাদেশের অবস্থা, পাকিস্তানি সেনা কর্তৃক সর্বত্র তাণ্ডব, নৃশংস অত্যাচারের চিত্র।

নাটকে গ্রেপ্তার হওয়া ছয় চরিত্র সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির অন্তর্গত। আনিসুজ্জামান পেশায় ডাক্তার, যামিনী নাট্যকার, হাসমৎ যামিনীর বন্ধু ও মধ্যবিত্ত সাধারণ ব্যক্তি। এরা তিনজনেই পাতি বুর্জোয়া শ্রেণির অন্তর্গত। সাহাবুদ্দিন চৌধুরী সমাজের পুঁজিপতি ব্যবসায়ী। দিনমজুর নানী একসময় তার কারখানারই শ্রমিক ছিল এবং হাসিবুনের মা রাবেয়া সাহবুদ্দিনের কারখানাতে এক দুর্ঘটনায় মারা যায়। কারণ সাহাবুদ্দিন যন্ত্রের মেরামত করেনি। নাটকে প্রত্যেকটি চরিত্রের মনস্তত্ব বিশ্লেষিত হয়েছে। বিশেষ করে যামিনী, সাহাবুদ্দিন ও নানীর।

প্রত্যেকের মানসিক দৃঢ়তা এবং মনের উদারতা ও সংকীর্ণতা তাদের শ্রেণির সঙ্গে যুক্ত। যেমন যামিনী যখন জানতে পারে তার স্ত্রী সেলিমা যে সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে মারা যায় সেই সন্তানটি আসলে ছিল তার বন্ধু হাশমতের। তখন তার কাছে পৃথিবীর সব কিছুই প্রতারণা বলে মনে হয়েছে। মনে হয়েছে সে জীবনে ব্যর্থ একজন ব্যক্তি। কিন্তু তার মধ্যে নায়কোচিত (Heroic) ব্যাপার কাজ করত; আর সেটা তার মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে নাটকে বিভিন্ন নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করতে করতে। সেজন্যই সে যখন দেখেছে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী তখন পাক-অফিসার ওয়ালিউল্লাহর কাছে গিয়ে বোখারির মৃত্যুর দায় নিজের ঘাড়ে নিয়ে নিজের প্রাণের বিনিময়ে বাকি পাঁচ জনের প্রাণ বাঁচাতে চেয়েছে। যাতে সে নায়কের সার্থকতা পেয়ে নিজের জীবনের গ্লানি মুছতে পারে। সাহাবুদ্দিন পুঁজিপতি ব্যবসায়ী। টাকা ও প্রতিষ্ঠার অহঙ্কার তার সর্বত্র। আনিসুজ্জামানের গবেষণা 'Notes on Death and Disintegration of Psychic Standards' - এ তার চরিত্র ব্যাখ্যা হয়েছে এভাবে— 'Extrovert, sublimating his fears... মৃত্যুর সম্ভাবনা পর্যন্ত অস্বীকার করেছে... মৃত্যুর কাছাকাছি এসে তার নৈতিক, মানসিক ও সামাজিক মান সম্পূর্ণ ধ্বসে গেছে।'[১৫] উৎপল দত্তের 'বিপ্লবী থিয়েটার'-এ পুঁজিপতি শ্রেণির কলুষিত দিক বারবার উঠে এসেছে—যা শ্রেণিঘৃণা উদ্রেক করতে বিশেষ সহায়তা করে, দর্শকের চিনে নিতে সুবিধা হয় তাদের শত্রুকে। এ নাটকেও তার অন্যথা দেখি না। সাহাবুদ্দিন চৌধুরীদের কাছে দেশ, জনগণ, সমাজ, পাপ-পুণ্য এসবের কিছু মূল্য নেই। তারা একমাত্র নিজেদের জন্যই বাঁচে আর নিজেদের মুনাফা বৃদ্ধির চেষ্টা করে। সে নিজের প্রাণ বাঁচাতে কর্নেল ওয়ালিউল্লাকে অর্থের লোভ দেখিয়েছে। এমনকি যেখানে যামিনী বোখারির মৃত্যুর দায় নিজের ঘাড়ে নিয়ে বাকি পাঁচজনকে বাঁচাতে চেয়েছে, সেখানে সাহাবুদ্দিন নানীর ঘাড়ে সেই দোষ চাপিয়ে নিজে বাঁচতে চেয়েছে। সেজন্য শেষপর্যন্ত সকলের কাছে সে ঘৃণার পাত্র হয়েছে। রশিদা খাতুন ওরফে নানীকে নাটকের প্রধান চরিত্র বলা যেতে পারে। তার বুদ্ধিমত্তা ও চারিত্রিক দৃঢ়তার উপর মুক্তিযোদ্ধাদের অগাধ ভরসা। সেজন্যই তারা তাকে ও তার দোকানকে নিজেদের কাজের কেন্দ্র বানিয়েছে। কোন ঠিকানায় ডিনামাইট পাওয়া যাবে তা কেবল জানত নানী; কিন্তু সে কারাবন্দি। তারপরেও তার উপর মুক্তিযোদ্ধা মকবুলের ভরসা আছে। নাটকেও সে তার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় রেখেছে। বোখারির দেওয়া একটি চিঠি তার দোকানে থেকে গেছে—এই অজুহাত দিয়ে জেলের বাইরে বেরিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের সেই ঠিকানা সে জানিয়ে দিয়ে গেছে। তার চারিত্রিক দৃঢ়তার পরিচয় মেলে সপ্তম দৃশ্যে। যেখানে ওয়ালিউল্লা তার অভিসন্ধির কথা জানতে পেরে তার উপর অকথ্য অত্যাচার করেছে। জানতে চেয়েছে তার জেলের বাইরে যাওয়ার কী উদ্দেশ্য ছিল? তার গায়ে নাইট্রিক অ্যাসিড ঢেলে, জ্বলন্ত চুরুটের ছ্যাঁকা দিয়ে জানতে ছেয়েছে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির নেতা এবং আওয়ামীলিগের লোকজনের পরিচয়; কিন্তু সে বলেনি। আনিসুজ্জামানের কথায়, 'বীর বলতে যা বোঝায়, হিরো বলতে ইতিহাসে যা বুঝিয়েছে, রশিদা খাতুন বোধহয় তাই। তাঁর নীরব বীরত্বের কাছে মৃত্যু পরাজিত।'[১৬]

নাটকের শেষ হয়েছে বন্দি পাঁচ জনের মৃত্যু দিয়ে। হাসিবুনের বয়েস অল্প বলে তাকে শেষ পর্যন্ত মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়নি। মৃত্যুকালে আনিসুজ্জামান কেবল নিজের ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠা ছাড়া আর কিছুই মনে করেনি। বাকি চার জন বাংলাদেশের জয়ধ্বনি ও ভবিষ্যতের স্বাধীনতার স্বপ্ন নিয়ে মৃত্যুবরণ করেছে। আর নাটকের শেষ হয়েছে ডিনামাইটের বিস্ফোরণে বারুদের গাড়ির বিধ্বস্ত হওয়ার আওয়াজে।

উৎপল দত্তের 'জয় বাংলা' নাটকটি রবীন্দ্র সদন মঞ্চে ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭১ সালে প্রথম অভিনীত হয়। উৎপল দত্ত নাটকটিতে বাংলাদেশের দুটি সংকটকে তুলে ধরেছেন—একটি পাকিস্তান সেনা দ্বারা সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার, নারীদের সম্মানহানি, গণহত্যা, রাহাজানি ইত্যাদি; আর অন্যদিকে দবিরুল হোসেনের মতো মহাজনদের অত্যাচারে বড়মিয়ার মতো সাধারণ মানুষের অসহায় অবস্থা। সেজন্যই নাটকে আমরা বাংলাদেশের

জনগণকে এই দুপক্ষের সঙ্গেই প্রাণপণ লড়াই করতে দেখি। মুক্তিযুদ্ধের পূর্বে ও সমসময়ে বাংলাদেশের সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল পাকিস্তানি শাসকের প্রেক্ষিতে ঔপনিবেশিক, সাম্রাজ্যবাদী ও সম্প্রসারণবাদী শোষকের প্রেক্ষিতে আধা ঔপনিবেশিক এবং আভ্যন্তরীণ সামন্তবাদের প্রেক্ষিতে আধা সামন্ততান্ত্রিক। এরকম পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে যে বিপ্লবের উত্থান ঘটেছিল তার চরিত্র ছিল দুটি— ১. পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শোষণ ও আধা সাম্রাজ্যবাদী শোষণ থেকে মুক্তির প্রশ্নে এটি 'জাতীয় মুক্তি বিপ্লব' এবং ২. আভ্যন্তরীণ সামন্তবাদী শোষণ থেকে মুক্তির প্রশ্নে এটি 'গণতান্ত্রিক বিপ্লব'।[১৭]

মৌলবী মোজাম্মেল হকের কন্যা নাজের সঙ্গে বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈনিক লেফটানেন্ট ওয়াহেদ আলির বিয়ের আশীর্বাদ অনুষ্ঠান দিয়ে নাটকের সূচনা। সেই আশীর্বাদ অনুষ্ঠানে আখলাকুর রহমান ওরফে বড়মিয়া এসে জানাচ্ছে যে, তারা নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে সপরিবারে মোহাম্মদপুর ছেড়ে চলে যাচ্ছে খেয়ালির চরে গা-ঢাকা দিতে। কারণ পশ্চিম-পাকিস্তানের সেনা পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণের উপর নৃশংস অত্যাচার চালাচ্ছে এবং সেই সঙ্গে পূর্ব-পাকিস্তানের বাঙালি অধিবাসীরা নিজেদের স্বাধীন করতে 'মুক্তিযুদ্ধ' ঘোষণা করেছে। এই বড়মিয়া ভীত ব্যক্তি নন, সে একজন গেরিলা যোদ্ধা। কিন্তু সে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেবে না; কারণ শত্রুর হাত থেকে নিজের দেশ রক্ষা করলেও তার অবস্থার কোনও উন্নতি হওয়ার আশা সে দেখে না। কারণ দবিরুল হোসেনের মতো মহাজনরা চিরকাল তাদের শোষণ করে, ঋণের জালে আবদ্ধ করে। তারা খেয়ালির চরের উদ্দেশ্যে রওনা হলে দবিরুলও নিজেকে পাকিস্তানি সেনার হাত থেকে বাঁচাতে বড়মিয়ারই শরণাপন্ন হয়। ঘটনাক্রমে পাকিস্তানি সেনার ব্রিগেডিয়ার ইফতিকার খাঁ মৌলভি মোজাম্মেল হকের বাড়িতে প্রবেশ করে বড়মিয়ার বর্তমান ঠিকানা জানার জন্য। তারা না বলতে চাইলে তাদের হুমকি দেয়, এমনকি মেয়ে নাজের উপর শারীরিক অত্যাচার করতেও পিছপা হয় না। অবশেষে নিজের মেয়েকে বাঁচাতে ঠিকানা বললেও পাকিস্তানি সেনা মৌলভীকে হত্যা এবং নাজকে নির্মমভাবে ধর্ষণ ও বন্দি করে। এদিকে ওয়াহেদ আলি পাকিস্তানি সেনার চাকরি ছেড়ে মুক্তিযুদ্ধে নিজেকে সমর্পণ করেছে এবং পূর্বতন গেরিলা সেনানায়ক বড়মিয়ার খোঁজে খেয়ালির চরে এসে উপস্থিত হয়েছে, যাতে পুনরায় বড়মিয়াকে বন্দুক ধরতে রাজি করাতে পারে। অন্যদিকে পাকিস্তানি সেনাও বড়মিয়ার খোঁজে খেয়ালির চরের দিকে রওনা হয়। এক্ষেত্রে তাদের হামিদ শেখ বলে একজন নৌকার মাধ্যমে নদী পার করতে সাহায্য করে। পরবর্তীতে দেখা যায় বড়মিয়াই আসলে এই হামিদ শেখের ছদ্মবেশ ধারণ করেছিল। তারই সাজানো প্ররোচনায় পাকিস্তানি সেনা সেদিন পরাজিত হয়। আলি ইয়ার খাঁ বন্দি হয়। পরিশেষে তাকে হত্যা করে নাজ নিজের প্রতিশোধ নেয়। কিন্তু অবশেষে দবিরুল হোসেনের বিশ্বাসঘাতকতার সুযোগ নিয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনী বড়মিয়ার সন্ধান পেয়ে যায়। বড়মিয়াকে হত্যা করতেও তারা সক্ষম হয়। তবুও ওয়াহেদ আলি ও নাজকে তারা সেখানে পায়না। কারণ ভবিষ্যত লড়াইয়ের সম্ভাবনা বজায় রাখতে তারা নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে আগেই সেখান থেকে অন্তর্হিত হয়ে যায়।

নাটকের কাহিনি অংশে আরও একটি বিষয় ধরা পড়ে— পূর্ব-পাকিস্তানের বাঙালি মুসলমানদের প্রতি পশ্চিম-পাকিস্তানের মুসলিমদের ঘৃণা। পশ্চিম পাকিস্তানিরা বাঙালিদের খুব ভালো চোখে কোনও দিনই দেখত না। ফিরোজ খান নুন ১৯৫২ সালে বলেছিলেন— এরা আধা-মুসলিম।[১৮] পশ্চিম-পাকিস্তানিরা বাঙালি মুসলিমদের ভীতু এবং অকেজো মনে করত। সেজন্যই পশ্চিম পাকিস্তানি-নেতৃবৃন্দ নিজেদের ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য কেন্দ্রীয় আইন সভায় বাঙালি সদস্য সংখ্যা কমাতে চেয়েছিলেন। প্রশাসনের উচ্চ পদে বাঙালির সংখ্যা ৩০ শতাংশের বেশি কোনো দিনও যায়নি। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সচিবের পদে মাত্র তিন জন বাঙালি পেয়েছিলেন। ১৯৭০ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে একজন মাত্র বাঙালি ল্যাফটেনান্ট ছিলেন।[১৯] পাকিস্তান বাহিনীতে বাঙালি

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 37
Website: https://tirj.org.in, Page No. 312 - 322
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কখনও সমমর্যাদা পায়নি। নাটকের দ্বিতীয় দৃশ্যে বক্সিং ম্যাচে নাটককার সে কথা ব্যক্ত করেছেন। পশ্চিম-পাকিস্তানি আলি ইয়ার খাঁ বারবার নিয়ম ভাঙলেও তার কোনও ফাউল হয় না। উপরন্তু সঠিকভাবে ওয়াহেদ আলি ম্যাচ জিতলেও তাকে অযথা নিয়ম ভঙ্গের অভিযোগে পরাজিত ঘোষণা করা হয়— কেবলমাত্র বাঙালি হওয়ার দরুন। তার সঙ্গে আলি ইয়ার খাঁ হাত মেলাতে ঘৃণা বোধ করে। তাকে 'বাঙালি কুত্তা', 'আধা কাফের', 'বাঙালি গদ্দার' বলে অপমান করে। এছাড়াও তৃতীয় দৃশ্যে আলি ইয়ার খাঁ মৌলভী মোজাম্মেলকে সরাসরি বলে 'আপনি বাঙালি, মুসলমান নন' বা 'বাঙালি মুসলিমদের আমরা মুসলিম মনে করিনা' ইত্যাদি।

পাকিস্তান বাহিনী দ্বারা কবলিত ও শৃঙ্খলিত মাতৃভূমিকে অতুলনীয় শৌর্য-বীর্যের সঙ্গে অপরিসীম ত্যাগ স্বীকার করে বুকের রক্ত ঢেলে শৃঙ্খল মোচন করেছে যারা— সেই জীবনের আলেখ্য হয়ে উঠেছে দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দুরন্ত পদ্মা' (১৯৭১) নাটকটি। বাংলাদেশকে স্বাধীন করতে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ-বয়স নির্বিশেষে দেশের আপামর নাগরিক ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। এ প্রসঙ্গে মুক্তিযোদ্ধা কাদের সিদ্দিকী লিখেছেন—

> "বাংলার স্বাধীনতা যুদ্ধে ছাত্রলীগ, ছাত্র-ইউনিয়ন, শ্রমিক লীগ, কৃষক লীগ ও আওয়ামীলীগ সহ অন্যান্য প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল ও গণসংগঠনগুলি গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করেছে। বিশেষত রাজনৈতিকভাবে সুশিক্ষিত প্রগতিশীল ছাত্র-সংগঠনগুলোর ভূমিকা স্বাধীনতাকে তরান্বিত করেছে। আপোস আলোচনার অজুহাতে ইয়াহিয়া যখন সময় কাটাচ্ছিলো, তখন বাংলার ঘরে ঘরে ব্যাপক অবিশ্বাস ও সন্দেহ ঘনীভূত হচ্ছিল। ছাত্র-শ্রমিক সংগঠনগুলো ইতিমধ্যেই বুঝে নিয়েছিল, পশ্চিম-পাকিস্তানী কায়েমী স্বার্থবাদী চক্র বাঙালীর ন্যায্য অধিকার আপোসে ছেড়ে দেবে না। কারণ এই কায়েমী স্বার্থবাদী সাম্রাজ্যবাদী চক্র যুগ যুগ ধরে বাঙালীকে শোষণ করে ফুলে ফেঁপে উঠেছে। বাঙালীর হাতে ক্ষমতা ছেড়ে নিজের স্বার্থহানি ঘটাতে পারেনা তারা।"[২০]

'দুরন্ত পদ্মা' নাটকে সেই দৃষ্টিভঙ্গি পাওয়া যায়। চরিত্র সঞ্চয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বিচিত্র শ্রেণির নাগরিক স্থান পেয়েছে এখানে। মেজর খালেদ, ক্যাপ্টেন মাফুজ ও ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস-এর হাবিলদার মান্নান— এরা মূলত কর্মের দিক থেকেই ছিল সৈন্য, যুদ্ধ-ব্যবসা ছিল এদের একমাত্র কাজ। বাকি চরিত্রদের মধ্যে আছে ছোট ব্যবসায়ী, শ্রমিক, চাষি, ছাত্র-ছাত্রী, ডাক্তার, ঘরের গৃহিণী ইত্যাদি সাধারণ নাগরিক। যেমন— ছাত্র লীগের মুক্তিযোদ্ধা রফিক, ছাত্র ইউনিয়নের মুক্তিযোদ্ধা অজিত, আওয়ামী লীগের যুবনেতা তাজিক আলি, বামপন্থী শ্রমিক নেতা জামাল উদ্দিন, সাধারণ শ্রমিক টিটু মিয়া, হিটলু মিয়া ও আজিজ, অবাঙালি বাংলাদেশ নিবাসী শ্রমিক মনু মিয়া, সাধারণ চাষি গেদু মিয়া, বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত ব্যবসায়ী রহমান, চিকিৎসক ডা. সামসুদ্দিন, কিশোর বয়সী হাবিব এবং নারী চরিত্রগুলির মধ্যে আছে কলেজ ছাত্রী তথা মুক্তিযোদ্ধা শিরিন বানু ও তার মা তথা রহমানের স্ত্রী হামিদা বিবি, হিন্দু নার্স বিনতা, ছেলে হারানো একমাত্র সম্বল নাতি হাবিবকে চেয়ে বেঁচে থাকা মুন্না বিবির মতো চরিত্র। মুক্তিযুদ্ধে নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী এরা সকলেই ভূমিকা পালন করেছে। কেউ সরাসরি যুদ্ধে অংশ নিয়েছে তো কেউ যোদ্ধাদের অন্যান্য প্রয়োজনে সাহায্য করেছে। মুক্তিযুদ্ধ ছিল বাংলাদেশের সাধারণ নাগরিকদের শোষণমুক্ত সমাজ গড়ার এক সাহসী সংগ্রাম। সেই সংগ্রামের নাটকীয় রূপ 'দুরন্ত পদ্মা'। সেজন্যই নাটককার এখানে এত বিচিত্র সব চরিত্রের সমাহার ঘটিয়েছেন।

এই নাটকে আমজাদ মিয়া নামে এক চরিত্রের আগমন ঘটেছে। যে বাংলাদেশের একজন মহাজন ও জোতদার এবং পশ্চিম-পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর সমর্থক। বাংলাদেশের সাধারণ জনগণের যুদ্ধে এই আমজাদ মিয়ার মতো পুঁজিপতিরা নির্লজ্জের মতো পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সমর্থন করে গেছে। অথচ নাটকে দেখা যায় পাকিস্তান সেনাবাহিনী তার প্রতি চাকরতুল্য ব্যবহার করে। নাটককার তাকে একটা বিশ্বাসঘাতক চরিত্ররূপে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 37
Website: https://tirj.org.in, Page No. 312 - 322
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

তৈরি করেছেন। সেজন্যই মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তান সেনার ছাউনি ঘিরে ফেললে সেই তাদের পথ চিনিয়ে সেখান থেকে বার করে। কাদের সিদ্দিকী জানান, এরা দালালদের মতো কাজ করেছিল এই সময়। তাদের মধ্যে বেশ কিছুজন একত্রে শান্তিরক্ষা কমিটি গঠন করেছিল। কিন্তু সেই কমিটি শান্তি রক্ষার নামে সমস্তরকম অশান্তি ছড়ায়। রাজাকার বানানো, ঘরবাড়ি জ্বালানো, লুঠতরাজ, নারী অপহরণ, ধর্ষণ, খুন সবই তারা করে।[২১] এরা প্রথম থেকেই চেয়েছিল পাকিস্তানকে ইসলামিক রাষ্ট্রে পরিণত করতে। সেজন্য তারা সেখানে বসবাস করা হিন্দুদের বিতাড়িত করতেও পিছপা হয়নি।[২২] চতুর্থ দৃশ্যে রহমানের সঙ্গে আমজাদ মিয়ার কথোপকথনে এরকম কথাই উঠে আসে। আমজাদ মিয়াও শান্তি রক্ষা কমিটি গঠনের কথা বলে এবং হিন্দুরা যাতে দেশ ছেড়ে চলে যায় সেই মতও ব্যক্ত করে। নাটককার এখানে মুক্তিযুদ্ধের দুটি উদ্দেশ্যের কথা ইঙ্গিত করেছেন— প্রথমটি হল পাকিস্তানি হানাদারদের মুক্ত করে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা এবং শোষণমুক্ত সমাজ-ব্যবস্থা গঠন হল দ্বিতীয়। সেজন্য বহিঃশত্রুর সঙ্গে লড়াই একমাত্র কাম্য নয়, লড়াইয়ের অভিমুখ অন্তঃশত্রুর দিকেও। আমজাদ মিয়ার মতো জোতদার, মহাজনদের হাত থেকেও সাধারণ মানুষকে রক্ষা করতে হবে। বাংলাদেশের সাধারণ নাগরিকদের এই সংগ্রামকে তাই নাটককার পূর্ণ স্বাধীনতার সংগ্রাম হিসেবে তুলে ধরেছেন। সেজন্যই নাটকে ধ্বনিত হতে শোনা যায়—

> "পলাশীর আম্রকাননে যে স্বাধীনতা সূর্য একদিন অস্ত গিয়েছিল, মুজিবনগরের আম্রকাননে বাঙলাদেশের সেই স্বাধীনতা সূর্যের আবার উদয়।"[২৩]

অনিল দে-এর 'দূর্বার বাংলা' একাঙ্কটি 'অভিনয়' পত্রিকায় ১৯৭১ সালে এপ্রিল-মে সংখ্যায় এটি প্রথম প্রকাশিত হয়। নাটকের পটভূমি ও বিষয় সম্পর্কে নাটককার স্পষ্ট জানিয়েছেন—

> "এ নাটকের পটভূমি বাংলা দেশের একটি গ্রাম। বাংলা দেশের মুক্তিযুদ্ধ এখন তার মধ্যগগনে। কোনো দেশের যুদ্ধ যখন সেই দেশের মানুষের প্রাণের তাগিদ হয়, তখন তাকে আমরা বলি মুক্তি যুদ্ধ। বাংলা দেশের যুদ্ধ সেই সংগ্রাম, যে সংগ্রামে গোটা একটা জাত মুক্তির পথ খুঁজছে। লড়াই শুরু হয়েছে গ্রামে গ্রামে, শহরে শহরে। লড়ছে সবাই। কেউ সামনে, কেউ পেছনে। এ নাটকে পেছনে যারা লড়ছে, তাদের লড়াইকে তুলে ধরা হয়েছে।"[২৪]

নাটকের কাহিনির পরিধি থেকেছে এক রাত্রি। নেপথ্য আবহে মুহুর্মুহু শোনা যায় বোমারু বিমানের গর্জন, বোমার বিস্ফোরণ, আর্ত চিৎকার এবং মিলিটারি বুটের ভারী শব্দ। চারিদিকে সন্দেহের বাতাবরণ। তাই প্রথম থেকেই সাহাবুদ্দিন ও সোরাবুদ্দিনের মাকে দেখা যায় যখনই তার বাড়িতে কেউ দরজা ঠুকেছে তখনই সে একটি বঁটি উঁচিয়ে দরজা খুলেছে। এমনকি নয়-দশ বছর বয়সি ইশাক ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। ইশাকের সঙ্গে মায়ের কথোপকথনে ধরা পড়ে পাকিস্তান সেনার অত্যাচারের এক নির্মম চিত্র। ইশাকদের বাড়িতে পাকিস্তান সেনা এসে তোলপাড় করে, তার বাবাকে ধরে নিয়ে গেছে, দুজন পাঞ্জাবী সেনা তার মা গর্ভবতী জেনেও তাকে ধর্ষণ করেছে—এই নির্মম অত্যাচারের জন্য তার গর্ভের সন্তান নষ্ট হয়ে গেছে। নাটকের আরেকটি চরিত্র আফতাব অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে লিপ্ত হয়নি, কিন্তু সশস্ত্র যোদ্ধাদের বাইরে থেকে সাহায্য করেছে—যুদ্ধের পরিস্থিতিতে এলাকাবাসীদের সচেতন করেছে, আওয়ামী লীগের বিভিন্ন বার্তা সকল বাসিন্দাদের বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছে, পাকিস্তানি সেনাদের বিভিন্ন খবর মুক্তিযোদ্ধা ও আওয়ামী লীগের অফিসে নিয়ে গেছে এবং মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য খাবারের বন্দোবস্ত করেছে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 37
Website: https://tirj.org.in, Page No. 312 - 322
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কাহিনির অগ্রগতিতে দেখা যায় দুজন পাকিস্তানি সেনা দেবতোষ ও মইজুদ্দিন ছদ্মনামে সাহাবুদ্দিন ও সোরাবুদ্দিনের মায়ের কাছে এসেছে আওয়ামী লীগের গুপ্ত অফিস ও বেতারকেন্দ্রের সন্ধান জানতে। কিন্তু তাদের দুর্ভাগ্য মায়ের কাছে সেই সন্ধান ছিল না। এসময় সেখানে আফতাব এবং পরে ইশাক এসে উপস্থিত হয়। তারা আফতাবকে কথার ছলে ভুলাতে পারে না, যেমন মাকে ভুলিয়েছিল। ইশাক প্রথম দেখাতেই দেখাতেই তাদের চিনতে পারে— এই দুজন সেনাই তার মাকে ধর্ষণ করেছিল। ইশাক সেখান থেকে বেড়িয়ে গিয়ে সোরাবুদ্দিনের কাছে সেই খবর দেয়। এদিকে আফতাবের কাছে কোনও খবর না পেয়ে সেনা দুজন আফতাবকে মায়ের অপরাধী প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে। কিন্তু শেষপর্যন্ত তা পারেনি। সোরাবুদ্দিন ইশাক সহ কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা সশস্ত্র অবস্থায় সেখানে উপস্থিত হয়। দ্বন্দ্বযুদ্ধে ইশাক দেবতোষের বন্দুকের গুলিতে নিহত হয় এবং সেই প্রতিশোধে মা বঁটি দিয়ে দেবতোষকে কুপিয়ে খুন করে।

বেরটোল্ট ব্রেখট স্পেনের গৃহযুদ্ধের (১৯৩৬-১৯৩৯) পটভূমিকায় রচনা করেছিলেন 'সেনোরা কারারের রাইফেল' (১৯৩৭) নাটকটি, সেই নাটকের অবলম্বনে স্বপন কুমার মিত্র পাকিস্তানের গৃহযুদ্ধ তথা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিকায় রচনা করলেন 'মুক্তির রাইফেল' একাঙ্কটি। শুরুতে নাটককার ব্রেখটের একটি উক্তি দিয়ে নাটকটির রাজনৈতিক দিক ব্যক্ত করেছেন—

> "সুন্দর সুন্দর কথার মালা গাঁথতে পারলেই শিল্প হবে এমন কোন মানে নেই। শিল্প মানুষকে নাড়া দেবে কি করে যদি মানুষের ভাগ্য শিল্পকে নাড়া না দেয়?"[২৫]

নাটকের কাহিনি বাংলাদেশের বাংলাদেশের এক খেটে খাওয়া পরিবারের মধ্যে আবদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধের একটি রাতেই কাহিনি আবর্তিত হয়েছে। রোশনারা বিবি তার দুই ছেলে হাসান ও হাবিবরকে যুদ্ধে যেতে দেয় না। কিন্তু যেখানে গোটা একটি জাতি শোষণমুক্ত সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ার তাগিদে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে সেখানে তারা যুদ্ধ থেকে বিরত থাকতে ইচ্ছুক নয়। তবে রোশনারা ভীতু বা স্বার্থপর নয়। রোশনারা নিজের স্বামীকে হাসিমুখেই মুক্তিযুদ্ধে সামিল হতে দিয়েছিল। কিন্তু সে যুদ্ধে শহীদ হলে রোশনারার মাতৃ মনের স্বাভাবিক দুর্বলতা কাজ করে, কারণ তারাই এখন তার বেঁচে থাকার একমাত্র আশ্রয়। কিন্তু ঘটনাচক্রে পাকিস্তানি সেনা অতর্কিতে গ্রামে হানা দেয়, চারিদিকে ভীষণ অত্যাচার, লুঠতরাজ চালাতে শুরু করে। এই পরিস্থিতিতেই শেষপর্যন্ত পাকিস্তানি সেনার গুলিতে হাসানের মৃত্যু ঘটে। রোশনারা নিজেকে ও তার দুই সন্তানকে যুদ্ধ থেকে নিরপেক্ষ ও দূরে রেখেও রেহাই পাইনি। বিপ্লবের সময় নিরপেক্ষ যে থাকা যায় না— এই সত্য সে বুঝতে পারে। তাই শেষপর্যন্ত সে ঘরে তুলে রাখা তার স্বামীর শেষ স্মৃতি চিহ্ন দুটি রাইফেল ওসমানের হাতে তুলে দেয়। এই রাইফেলই হয়ে উঠেছে মুক্তির রাইফেল।

৪

১৯৪৭ সালে বিভাজন হয়েছিল বৃহত্তর দুটি ধর্ম হিন্দু ও মুসলমান-এর স্বাধিকার রক্ষাকে কেন্দ্র করে। স্বাধীনতা পরবর্তী রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকার কাদের হাতে থাকবে, সেই দ্বন্দ্বের অন্তিম পরিণতি দেশভাগের (১৯৪৭) মাধ্যমে নিজেদের ক্ষমতায়ন প্রতিষ্ঠা। এই দেশভাগের ফলশ্রুতি ছিল ইসলামিক রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তানের গঠন। পাকিস্তানের দুই প্রান্তের বাসিন্দাদের ধর্ম যদিও ছিল এক, কিন্তু তাদের ভাষা, জাতি, সংস্কৃতির মধ্যে ছিল ভারত-ব্যবধান। ফলে নবগঠিত এই দেশের দুই উপকূলের মানুষের মানসিক দূরত্ব একে অপরের 'সেন্টিমেন্ট' বুঝতে অন্তরায় সৃষ্টি করে। স্বাধীনতা লাভের পর যেখানে ভারতবর্ষ নিজেকে ধর্ম-বর্ণ-জাতি-ভাষা-সংস্কৃতি নিরপেক্ষভাবে

প্রতিষ্ঠা দিতে সচেষ্ট হয়েছে, সেখানে পাকিস্তান প্রথম থেকেই কট্টরপন্থী মনোভাবের পরিচয় দিয়েছে। পূর্ব-পাকিস্তানের উপর চলেছে পশ্চিম-পাকিস্তানের অবদমন, শাসন ও শোষণ। সেজন্যই দেশভাগ ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার (১৯৪৭) পর থেকেই ভিন্ন সংস্কৃতির দুই জাতির মধ্যে লড়াই ছিল লক্ষ করার মতো।

রাজনৈতিক নাটকের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য আন্তর্জাতিক কণ্ঠস্বর। পৃথিবীর কোনো প্রান্তে যদি কোনো মানুষ বা মানবগোষ্ঠী অন্যকোনো শক্তি দ্বারা নির্যাতিত হয় তাহলে রাজনৈতিক নাট্যকর্মীরা সর্বদায় নির্যাতিতের পাশে দাঁড়াই। বাংলা নাট্য-ইতিহাস এর একাধিক নিদর্শন রেখেছে। সেই ইতিহাসের একটি অধ্যায় হল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে লেখা নাটকগুলি। এক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের নাটককাররা অধিক সক্রিয় হয়েছিলেন। আগেই বলেছি এর পিছনে বাঙালি আবেগ অধিক গুরুত্ব পেয়েছিল। তাঁরা অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে বাংলাদেশের জনসাধারণের সংকট নিজেদের নাটকে তুলে ধরেছেন। পরতে পরতে উন্মোচন করেছেন মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্ব এবং পাকিস্তানি সেনার নৃশংসতা। এখানে যে নাটকগুলি আলোচিত হয়েছে সেগুলির মধ্যে বাংলাদেশের দুটি সংকট ধরা পড়েছে। একটি সংকট এসেছে পাকিস্তানি শাসক ও সেনাদের দিক থেকে এবং অপর সংকটটি এসেছে বাংলাদেশ নিবাসী পুঁজিপতি, জমিদার, জোতদার, মহাজনদের কাছ থেকে। এই দ্বিতীয় সংকটটি নাটকগুলিতে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। সেই সূত্রেই আনিসুজ্জামান, দাবিরুল, আমজাদ ইত্যাদি চরিত্রগুলি গুরুত্বপূর্ণ হয়েছে। আসলে এই দিকটা গুরুত্ব পাওয়ার পিছোনে কাজ করেছিল সমসাময়িক পরিস্থিতি। পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতে সেই সময় কমিউনিস্ট আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করেছিল। মার্ক্সসীয় দৃষ্টিভঙ্গী লেখকদের বিশেষভাবে আকর্ষণ করছিল। শ্রেণিশত্রুদের হাত থেকে সমাজকে রক্ষা করার বাসনা সকলের চিন্তা জগৎকে তরান্বিত করেছিল। সেজন্যই বাংলাদেশে যখন মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত হল, বাংলাদেশ নিবাসীরা যখন নিজেদের জন্য পূর্ণ-স্বাধীন দেশ প্রতিষ্ঠা করতে চাইল, তখন এপার বাংলার নাটককাররা সেই দেশকে সকল শত্রুর করাল গ্রাস থেকে মুক্ত দেখতে চেয়েছিল। ফলে তাঁদের নাটকগুলিতেও মুক্তিবাহিনীকে এই দ্বিবিধ শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলা করিয়েছেন।

Reference:

১. মাসকারেনহাস, অ্যান্থনী; *দ্যা রেইপ অব বাংলাদেশ,* রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী (অনু.), পপুলার পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ৩৪

২. ক. সরকার, অভীক (সম্পা.); *বাংলা নামে দেশ,* আনন্দ, কলকাতা, এপ্রিল ১৯৭২, পৃ. ২৬

খ. মাসকারেনহাস, অ্যান্থনী; *দ্যা রেইপ অব বাংলাদেশ,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮

গ. মামুন, মুনতাসীর (সম্পা.); *মুক্তিযুদ্ধ কোষ,* সময় প্রকাশন, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১৩, পৃ. ৩৪

৩. ক. সরকার, অভীক (সম্পা.); *বাংলা নামে দেশ,* প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬

খ. মামুন, মুনতাসীর (সম্পা.); *মুক্তিযুদ্ধ কোষ,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭-৩৮

৪. ক. সরকার, অভীক (সম্পা.); *বাংলা নামে দেশ,* প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮

খ. মামুন, মুনতাসীর (সম্পা.); *মুক্তিযুদ্ধ কোষ,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭

গ. মাসকারেনহাস, অ্যান্থনী; *দ্যা রেইপ অব বাংলাদেশ,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০

৫. মাসকারেনহাস, অ্যান্থনী; *দ্যা রেইপ অব বাংলাদেশ,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১-১১২

৬. ক. সরকার, অভীক (সম্পা.); *বাংলা নামে দেশ,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

খ. মাসকারেনহাস, অ্যান্থনী; *দ্যা রেইপ অব বাংলাদেশ,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮

৭. ক. সরকার, অভীক (সম্পা.); *বাংলা নামে দেশ,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

খ. মাসকারেনহাস, অ্যান্থনী; *দ্যা রেইপ অব বাংলাদেশ,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯

৮. হাসান, শফিকুল; *মুক্তির সংগ্রামে পূর্ব বাংলা,* রঞ্জন প্রকাশনী, কলকাতা, কার্তিক ১৩৭৮, পৃ. ৬-৭

৯. তদেব, পৃ. ১৩

১০. তদেব, পৃ. ১৪

১১. গুহ, রামচন্দ্র; *গাঁধী উত্তর ভারতবর্ষ,* আশীষ লাহিড়ী (অনু.), আনন্দ, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ৪০৬

১২. সেনগুপ্ত, বরুণ; *ইন্দিরা একাদশী,* রচনা সংগ্রহ, আনন্দ, কলকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ, ২০১২, পৃ. ৫৪২

১৩. দাশগুপ্ত, অভিজিৎ; *বিস্থাপন ও নির্বাসন : ভারতে রাষ্ট্র-উদ্বাস্তু সম্পর্ক,* আশীষ লাহিড়ী (অনু.), কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ১৭২

১৪. দত্ত, উৎপল; *নাটক সমগ্র,* পঞ্চম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ, আশ্বিন ১৪২২, পৃ. ৬০১

১৫. দত্ত, উৎপল; *ঠিকানা,* নাটক সমগ্র, পঞ্চম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ, আশ্বিন ১৪২২, পৃ. ৬০

১৬. তদেব, পৃ. ৬০

১৭. হাসেন, শফিকুল; *মুক্তির সংগ্রাম পূর্ব বাংলা,* রঞ্জন প্রকাশনী, কলকাতা, কার্তিক ১৩৭৮, পৃ. ৬৭

১৮. সরকার, অভীক (সম্পা.), *বাংলা নামে দেশ,* আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, এপ্রিল ১৯৭২, পৃ. ১২

১৯. মাসকারেনহাস, অ্যান্থনী; *দ্যা রেইপ অব বাংলাদেশ,* রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী (অনু.), গ্রন্থস্বত্ব, ঢাকা, জুলাই ২০১০, পৃ. ৩৫

২০. সিদ্দিকী, কাদের; *স্বাধীনতা '৭১,* বঙ্গবন্ধু প্রকাশনী, ঢাকা, দ্বিতীয় প্রকাশ, জুন ১৯৯২, পৃ. ১০

২১. তদেব, পৃ. ৫৮৬

২২. তদেব, পৃ. ৫৯০-৫৯১

২৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, দিগিন্দ্রচন্দ্র; *দুরন্ত পদ্মা,* নির্মল সাহিত্য মন্দির, কলকাতা, ডিসেম্বর ১৯৭১, পৃ. ১৭০

২৪. দে, অনিল; *দুর্বার বাংলা,* দিলিপ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.), অভিনয়, দ্বিতীয় বর্ষ, ৩-৪ সংখ্যা, এপ্রিল-মে ১৯৭১, পৃ. ২৩৭

২৫. মিত্র, স্বপন কুমার; *মুক্তির রাইফেল,* সুনীল দত্ত (সম্পা.), একালের একাংক, চতুর্থ খণ্ড, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, ১৩৮০, পৃ. ১১৫